চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ

সুবোধ ঘোষ

আমাদের ক্লাসটা ছিল একটি নৃতত্ত্বের ল্যাবরেটরীর মতো। এমন বিচিত্র মানবতার নমুনা আর কোন্ স্কুলে কোন্ ক্লাসে আছে জানি না। তিনটি রাজার ছেলে ছিল আমাদের ক্লাসে। একজন জংলী রাজার ছেলে, কুচকুচে কালো চেহারা। আর দু'ঝন ছিল সত্যিকারের ক্ষত্রিয়াত্মক—সুগৌর গায়ের রঙ, পাগড়ীতে সাঁচ্চা মোতির ঝালর ঝুলতো। তাছাড়া ছিল—সিরিল টিগ্‌গা, ইম্যানুয়েল খাল্‌খো, জন বেস্‌রা, রিচার্ড টুডু আর ষ্টাফেন হোরো এবং আরো অনেকে। এক ওঁরাওঁ আর মুণ্ডা সন্তানের সমাবেশের মাঝখানে তবু আমরা ক'জন ইন্টার ক্লাস পরিবারের বাঙালী ও বিহারী ছেলে শুধু বুদ্ধির জোরে সর্বকর্মের মোড়লীর গৌরব অধিকার ক'রে বসেছিলাম। রাজার ছেলেগুলোকে আমরা বলতম সোনা ব্যাঙ, আর মুণ্ডা ও ওরাওঁদের বলতাম কোলা ব্যাঙ। ওদের কাওকে আমরা কোন দিন গ্রাহ্যের মধ্যে আনতাম না। রাজার ছেলেগুলি অবশ্য আমাদের সঙ্গে কথা বলত না। অপর পক্ষে টিগ্‌গা, খাল্‌খো, বেসরা, টুডু—ওরা আমাদের সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারলে ধন্য হয়ে যেত। টিফিনের সময় একটা আনি নিয়ে টুডুকে দিতাম। বলতাম—টুডু চট্ করে এক দৌড়ে এই এক আনার ঝালবাদাম নিয়ে এস তো। গঙ্গা সাহুর দোকান থেকে আনবে।

স্কুল থেকে গঙ্গা সাহুর দোকান দেড় মাইল হবে। কৃতার্থভাবে আনিটা হাতে তুলে নিয়ে টুডু সেই প্রচণ্ড রোদে ঝলসানো মাঠের ওপর দিয়ে পোড়া হরিণের মতো উদ্দাম বেগে দৌড়ে চলে যেত গঙ্গা সাহুর দোকানে। ফিরে এসে ঝাল বাদামের ঠোঙাটা আমাদের হাতে সঁপে দিয়ে নিজে দূরে সরে যেত। আমরা বলতাম—কী আশ্চর্য টুডু এতটা পথ দৌড়ে এলে তবু তুমি একটুও হাঁপাচ্ছো না।

এই ফাঁকা কথার কারসাজীটাকে আন্তরিক অনিভনন্দন মনে করেই টুডু দূরে দাঁড়িয়ে গর্বভরে হাসতো। আমরা চোখ টিপে লক্ষ্য করতাম—টুডু কেমন জোর করে তার পরিশ্রান্ত শ্বাসবায়ুটাকে ঢোঁক গিয়ে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। তাকে ঝাল বাদামের একটু শেয়ার দিতে আমরা বোধ হয় ইচ্ছে করেই ভুলে যেতাম। দিতে গেলেও টুডু নিত না।

আমরা দেখতাম, একটু দূরে দাঁড়িয়ে সুতীব্র একটা দৃষ্টি দিয়ে ষ্টীফান হোরো আমাদের হাবভাব লক্ষ্য করছে। আমরা ঘাবড়ে যেতাম। ষ্টীফান যেন তীর মেরে আমাদের বুকের ভেতর ধূর্ত রসিকতার ফুসফুসটাকে খুঁটিয়ে দেখছে। সব বুঝে ফেলতে পারছে। কিন্তু সবার মধ্যে একমাত্র ষ্টীফেনই পারে, আর কেউ নয়?

টুডু, খাল্‌খো, টিগ্‌গা, বেস্‌রা সকলেই কতকটা এই রকমেরই বাধ্য বেকুব বিশ্বাসী আর নিরীহ ছিল। আমরা মনে মনে হাসতাম। —হায়রে, রাঁচীর জঙ্গলের যত কোল, যত সব কোলা ব্যাঙ।

ওদের মধ্যে ঐ একটি মাত্র কাল কেউটে ছিল, ষ্টীফান হোরো। বড়ো উদ্ধত ছিল ষ্টীফানের স্বভাবটা। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, হোরোর কাছে আমাদের আভিজাত্য চুপে চুপে হার মেনে নিত। ওর সঙ্গে সদ্ভাব রাজার জন্য মাঝে মাঝে যেচে ওর সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে। আরও লজ্জার বিষয়, হোরো এক এক সময় আমাদের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিত। ঐ মাথাঠাসা মোটা মোটা চুলের ঘুঙর, চেপ্টা নাক, আবলুস কালো চেহারা—তবু এত অহঙ্কার!

ষ্টীফানের ওপর প্রথম একটু ভয় ও শ্রদ্ধা হল একটা ঘটনায়। সেদিন খেলার মাঠে দেখলাম—হোরো হকি ষ্টিক আনেনি। হোরো তবু খেলতে চায়। কিন্তু নিজের হকি ষ্টিক নিয়ে খেলতে হবে—এই ছিল আমাদের নিয়ম। হোরো বার বার আমাদের অনুরোধ করল—কিছুক্ষণের জন্য কেউ আমাকে একটা ষ্টিক ধার দাও, এক হাত খেলেই আবার দিয়ে দেব।

কেউ কারও ষ্টিক পরের হাতে দিতে রাজী ছিল না। হোরো বলল—আমি বিনা ষ্টিকেই খেলব।

গোঁয়ার হোরো একটি ঘণ্টা আমাদের উদ্দাম হকি বাড়ি আর আছাড়ের সঙ্গে সমান স্বাচ্ছন্দ্যে পা দিয়ে খেলে গেল। হোরোর দুটি নিরেট শিশু কাঠের মতো পায়ের ওপর বেপরোয়া হকি ষ্টিক চালানোর সময় এক একবার সন্দেহে আমাদের হাত কেঁপে উঠেছে—ষ্টিকটাই ভেঙে না যায়।

ষ্টিফান হোরো ক্রমেই আমাদের ভাবিয়ে তুলছিল। শুধু ভয় আর শ্রদ্ধা নয়—আর একটা কারণে আমরা হোরোকে একবার ঈর্ষা করতে আরম্ভ করলাম। লেখা পড়ার ব্যাপারে হোরো আমাদের মনের শান্তি নষ্ট করতে চলেছে। ইংরেজী কবিতার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যায় আমাদের অন্যকেও পরাজিত করে ছাব্বিশ নম্বর বেশি পেল। ঘটনাটা জাতীয় অপমানের মতো আমাদের গায়ে বিঁধল। বেহারী ছাত্রদের জাতীয়তা কতটা ক্ষুন্ন হয়েছিল জানিনা, কিন্তু হোরোর সম্পর্কে একটা নিন্দার ষড়যন্ত্রে তারাও আমাদের সঙ্গে ইউনাইটেড ফ্রন্ট করল। আমরা বেশ জোর গলায় রটিয়ে দিলাম—এ স্কুলে অখৃষ্টানদের ওপর বড়ো অবিচার চলছে। মাষ্টারেরা সবাই খৃষ্টান। সুতরাং খৃষ্টান হোরো বেশী নম্বর পাবে তাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু কী ভয়ানক অন্যায়!

আমাদের অভিযোগকে মনে প্রাণে সত্য বলে বুঝলেন শুধু একমাত্র অকৃষ্টান শিক্ষক, সংস্কৃতের মাষ্টার বৈদ্যনাথ শর্মা—পণ্ডিতজী।

পণ্ডিতজী আমার সান্ত্বনা দিলেন। কি আর করবে বাবা। পাদরীদের স্কুলে এই রকমই অন্যায় কাণ্ড হয়ে থাকে। যাক্, ইউনিভার্সিটি তো আছে। সেইখানে ধরা পড়ে যাবে কার কতখানি যোগ্যতা।

প্রমোশনের পর নতুন বছরে ষ্টীফান হোরো আরও ভয়ানক এক গোয়ার্তুমি করে বসল—পা দিয়ে হকি খেলার চেয়েও ভয়ানক। ষ্টিফান হোরো তার অ্যাডিশনাল ইংরাজী ছেড়ে দিয়ে সংস্কৃত নিল। খৃষ্টান টীচারেরা সবাই হোরোকে ধমকালেন, হেডমাস্টার ফাদার লিণ্ডন ক্ষুণ্ণ হলেন, পণ্ডিতজী অদ্ভুতভাবে হাসতে লাগলেন। তবু অনার্য হোরো সংস্কৃত পড়ার প্রতিজ্ঞা তিলমাত্র বিচলিত হল না।

পণ্ডিতজী আমাদের আড়ালে ডেকে নিয়ে একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললেন—ষ্টিফান হোরো সংস্কৃত নিয়েছে। আর কি? এইবার দেবভাষার কপালে কি আছে কে জানে।

পণ্ডিতজী হাসতে লাগলেন। আমাদের কেমন সন্দেহ হল—পণ্ডিতজীকে যেন খুশী খুশী দেখাচ্ছে। যাক্।

শীঘ্রই আমাদের যত ধারণা সংশয় আশা ও আশঙ্কা পর পর কতগুলি ঘটনায় আরো জটিল হয়ে উঠতে লাগল।

নিউ টেষ্টামেন্ট থেকে ডজন ডজন গাথাগুলি আগাগোড়া নির্ভুল আবৃত্তি করে ফার্ষ্ট প্রাইজ পেল ষ্টীফান হোরো। সেকেণ্ড, থার্ড ও ফোর্থ প্রাইজের অগৌরবে মুখ শুক্‌নো ক'রে আমরা বসে রইলাম। ফাদার লিণ্ডন উচ্ছ্বসিত আনন্দে হোরোর প্রশংসা করে ঘোষণা করলেন—ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর তোমাকে নিশ্চয় দারোগা করে দেহো হোরো, আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম।

তা করতে পারেন ফাদার লিণ্ডন। এটুকু সুপারিশ করার ক্ষমতা তাঁর আছে, কিন্তু ঐটুকুই যদি ষ্টীফান হোরোর জীবনের পরমার্থ হয় হোক, তার জন্য আমরা মোটেই হিংসা করি না। তার জন্য এত কষ্ট করে নিউ টেষ্টামেন্ট মুখস্থ করার দরকার নেই আমাদের।

তারপরের দিনই বাইবেল ক্লাসে হোরোকে একেবারে ভিন্নরূপে দেখতে পেলাম আমরা। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে আমরা শুধু খাবি খেতে লাগলাম।

বাইবেল ক্লাসের একেবারে পেছনের বেঞ্চিতে বসেছিল হোরো। পড়াতে পড়াতে ফাদার লিণ্ডন বার বার পুলকিত নেত্রে হোরোকে প্রশ্ন করছিলেন—ষ্টীফান তুমিই উত্তর দাও। তুমিই সবচেয়ে ভাল উত্তর দিতে পারবে।

—জানি না স্যার। ষ্টীফানের রুক্ষ গলার স্বরে চমকে উঠে আমরা সবাই তার দিকে তাকালাম। দেখলাম, ষ্টীফান হোরোর আরও রুক্ষ ও বিরক্ত মুখটা ডেস্কের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। ফাদার লিণ্ডনের দিকে যেন তাকাতে চায় না হোরো।

ফাদার লিণ্ডনের সোনালী দাড়ির ওপর লালচে মুখে ক্ষণে ক্ষণে রক্তচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ছিল। চোখের দৃষ্টিটা তীব্র হয়ে উঠছিল। ষ্টীফানের দিকে তাকিয়ে রুষ্ট স্বরে বললেন—ষ্টীফান, আজ কি তোমার ব্রেনটাকে দরজার বাইরে রেখে ক্লাসে এসেছ তুমি। উত্তর দিতে পারছ না কেন?

—জানি না স্যার। আবার ষ্টীফান হোরোর সেই স্পষ্ট অবিচল ও অকুতোভয় উত্তর শুনে আমাদের বুকে দুরু দুরু শুরু হয়ে গেল। আকস্মিকভাবে অসময়ে ক্লাস বন্ধ করে ফাদার লিণ্ডন চলে গেলেন।

কিন্তু ষ্টীফান হোরোর এত রাগ কেন? এত অভিমান কেন? নিউ টেস্টামেন্ট মুখস্থ করে কার মাথা কিনেছে? কি হতে চায়। হাউস অব লর্ডস্-এর সদস্য?

এর পর বিপদে পড়লেন পণ্ডিতজী। পণ্ডিতজীর মতি-গতিও ক'দিন থেকে কেমন একটু অদৃশ্য দেখাচ্ছে। আমাদের এড়িয়ে যেতে পারলেই যেন পণ্ডিতজী একটু সুস্থ বোধ করেন। দেখা হলেই ব্যস্ত হয়ে সরে পড়েন। অথচ পণ্ডিতজীকে কত কথাই না জিজ্ঞাসা করার আছে। ফার্ষ্টটার্মিনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। এই তো যত নম্বর প্রমোশন আর পজিশন নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা গবেষণা ও কৌতূহলের সময়। পণ্ডিতজীর উদার হাতের নম্বর অনেক সময় আমাদের টোটালকে পরিস্ফীত করে কৃপণ খৃষ্টান শিক্ষকদের ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে। আজও আমরা তাই জানতে চাই—পণ্ডিতজী সবার জন্যে কতদূর করলেন। ইন্দুকে যদি একবার বুক পেতে পাশাপাশি দিয়ে দেন তবে টোটালে তার ফার্স্ট হওয়া সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না। সব খৃষ্টানী ষড়যন্ত্র জব্দ হয়ে যাবে।

পণ্ডিতজীর বাড়িতে গিয়েছি, লাইব্রেরী ঘরে একা একা পেয়েছি, পথে পথরোধ করেছি—কিন্তু পণ্ডিতজী কিরকম গোলমেলে কথা বলে সব কৌতূহল যেন চাপা দিতে চান। আমাদের সন্দেহ আরও প্রখর হয়ে ওঠে।

আমতা আমতা করে দু'বার মাথা চুলকিয়ে পণ্ডিতজী সত্য সংবাদটা ব্যক্ত করে বললেন—সংস্কৃতে ষ্টীফান হোরো সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে, একশোর মধ্যে পাঁচাত্তর।

—আর ইন্দু? আণাদের প্রশ্নে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পণ্ডিতজী অপরাধীর মতো বললেন—বত্রিশ।

মাত্র বত্রিশ। পণ্ডিতজীর মতো বিশ্বাসহন্তা পৃথিবীতে আর নেই। আমাদের ক্ষোভ অসংযত হয়ে উঠেছিল। পণ্ডিতজী মিনতি করে বললেন—ষ্টীফান হোরো এত ভাল সংস্কৃত লিখেছে, সে তো তোমাদেরই গৌরব, আর্যভাষার গৌরব। এতে তো তোমাদের খুশী হবার কথা। এটা হোরোর জয় নয়, এটা হলো সংস্কৃত ভাষার জয়।

চুলোয় যাক সংস্কৃত ভাষার জয়। ইন্দু ফাঁষ্ট হতে পারবে না এটা যে আর্যত্বের কত বড়ো

পরাভব, বাঙালীর কত বড়ো অপমান—তা পণ্ডিতজী বুঝলেন না। কিন্তু আমরা ঠিক রহস্যটি বুঝে ফেললাম—পণ্ডিতজী হলেন বেহারী, তাই।

কিন্তু বাতাসেলর নিশ্চয় সেই পরম গুণ আছে, যার জন্য শত অন্যায়ের অবরোধের মধ্যেও ধর্মের কল নড়ে ওঠে, লাইব্রেরী ঘরে যেদিন বোর্ড নিবদ্ধ মার্ক-শীটের কাছে আমরা গিয়ে চোখ তুলে দাঁড়ালাম, সেদিন আমরা বিশ্বাস করলাম—সত্যের জয় আছে, মিথ্যার পরাজয় আছে।

ইন্দুই ফার্স্ট হয়েছে। ষ্টীফান হোরো অনেক নীচে। ইংলিশে, ইতিহাসে, ভূগোলে, অঙ্কে—সব বিষয়ে অতি নগন্য নম্বর পেয়েছে ষ্টীফান হোরো, একমাত্র সংস্কৃত ছাড়া। ভেবে অবাক হলাম আমরা, খৃষ্টান টিচারেরা হোরোর ওপর হঠাৎ এত নির্দয় হয়ে উঠলেন কেন?

আরও কিছুদিন পরে ষ্টীফান হোরো আমাদের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য হয়ে গেল। শুধু আমাদের কাছে নয়, খাল্‌খো, বেসরা, টিগ্‌গা সবাই বলাবলি করে—কি জানি কি হয়েছে হোরোর।

বড়দিনের উৎসবে আমরাও পিকনিক করতে গিয়েছিলাম শিলোয়ারের জঙ্গলে। রান্নার কাঠের জন্য মহা উৎসাহে একটা মরা কেঁদ গাছ ভাঙছিলাম আমরা। হঠাৎ দেখলাম, স্রোতের ধার দিয়ে একা একা হোরো চলেছে। হাতে একটা গুলতি। আমরা চেঁচিয়ে ডাকলাম হোরোকে। এ রকম অভাবিত ভাবে হোরো যখন এসেই পড়েছে, তখন সেও আমাদের সঙ্গে এই বনভোজনের আনন্দের একটু শেয়ার নিক্ না কেন। পোলাও হবে, মাংস হবে, দই আছে, বৈকুণ্ঠ ময়রার সন্দেশ আছে। খেয়ে খুশী হবে হোরো। একেবারে আন্‌কোরা মুণ্ডা, জীবনে বোধ হয় এসব খায়নি কখন।

হোরো এগিয়ে এল। আমাদের কাছে এসেই একটা শাল গাছের শাখার দিকে নিবিষ্টভাবে তাকিয়ে রইল। তারপরেই শিকার লক্ষ্য করে গুলথি তুলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে একটা হৃষ্টপুষ্ট কাঠবিড়ালী আহত হয়ে ধপ্ করে মাটির ওপর পড়ল। একটা লাফ দিয়ে আহত কাঠবিড়ালীটাকে লুফে নিয়ে পকেটের ভেতর রাখল ষ্টীফান।

আমরা আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—ওটা কী হবে ষ্টীফান।

—খাব। নিঃসঙ্কোচে কথাটা বলে ফেলল হোরো। মনের ঘেন্না চেপে রেখে তবু আমরা হোরোকে নিমন্ত্রণ করলাম। ওসব ছুঁড়ে ফেলে দাও ষ্টীফান। পাগল কোথাকার। এস আমাদের পিকনিকে, তুমি খাবে আমাদের সঙ্গে।

না। হোরোর কাল মুখের ভেতর থেকে ঝক্‌ঝকে দুপাটি সাদা দাঁতের হাসি আপনি জানাল।

এরকম জংলী হয়ে যাচ্ছে কেন ষ্টীফান। রিচার্ড টুডু একদিন কানে কানে আমাদে

বলল—সত্যিই কি জানি হয়েছে হোরোর। বোধহয় শীগগির পাগল হয়ে যাবে। ফাদার লিণ্ডন আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন, হোরোর সঙ্গে যেন কেউ না মেশে।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—কেন টুডু।

টুডু—একজন বুড়ো সোখার সঙ্গে আজকাল বড়ো ভাব হয়েছে। লুকিয়ে লুকিয়ে প্রতিদিন মঙ্গলবারের হাটে গিয়ে সোখার সঙ্গে দেখা করে হোরো।

—তাতে কি এমন অপরাধ করেছে হোরো?

টুডু ভুরু কুঁচকে বলল—অপরাধ নয়? এতে বাইবেলের অপমান করেছে হোরো। চার্চে যায় না, কারও কথা শোনে না। তিনদিন বোর্ডিংয়ে ছিল না। ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

—বোর্ডিংয়ে ছিল না? কোথায় ছিল?

টুডু গলার স্বর আরও নামিয়ে চুপে চুপে বলল—বুরুতে গিয়েছিল। সেখানে নেচে গেয়ে এসেছে। পেট ভরে ইলি খেয়ে নেশা করেছে। তাছাড়া.....।

টুডু হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল। একটা কথা বলছি, কাউকে বোলো না যেন। জানতে পারলে হোরো আমায় মেরে ফেলবে।

টুডুকে অভয় দিলাম।—না, কেউ জানতে পারবে না, তুমি বল।

টুডু—একটি মেয়ের সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়েছে। মেটেয়ার নাম চিরকি, মোরাঙ্গি পাহাড়ের মুরমুদের মেয়ে।

টুডুর কথাগুলি মুগ্ধ হয়ে যেন গিলছিলাম আমরা। আমাদেরই সহপাঠী—দীন দরিদ্র মুণ্ডা হোরো, কতই বা বয়স? তবু সেই হোরো আজ এক মুহূর্তে আমাদের বাইবেল ক্লাস, সংস্কৃতের নম্বর আর হকি খেলার সব আনন্দ উত্তেজনাকে মূল্যহীন করে দিয়ে, এক রোমাঞ্চময় অনুরাগের ফুলে গিয়ে সবার অগোচরে নাম লিখিয়ে এসেছে। সেই মেয়েটি, চির্‌কি মুরমু তার নাম, তাকে যেন আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি। শাল ফুলের মালা গলায় দিয়ে, খোঁপায় এক নজবা গুঁজে, স্রোতে ভাষার মতো খল্ খল্ হাসির বন্ধনে হোরোর কালো হৃদয়ের সব বসন্তপনাকে বন্দী করে কোন্ উপত্যকার একটি নিভৃতে নিয়ে চলে গেছে। সেখান থেকে ফিরে আসার সাধ্য নেই হোরোর। কোন্ সাধেই বা আসবে?

টুডু তখনো সেই রকম পাকা পাকা কথা বলে চলছিল।—মুরমুরা বোঙা পুজো করে, ওদের সঙ্গে মেলামেশা কি উচিত হল? বড়ো ভুল করেছে হোরো।

ষ্টীফান হোরোকে বোর্ডিং থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, এটা শুধু একটা গুজব হয়েই রইল। কার্যতঃ দেখলাম, হোরোকে তাড়ানো হল না। নিজের ইচ্ছে মতো ক্লাসে আসে হোরো। নিজের ইচ্ছে মতোই অনুপস্থিত হয়। অনুগত খৃষ্টান ছাত্রেরা হোরোকে এড়িয়ে যায়। হোরো

রিচার্ড টুডু যে-আশঙ্কা প্রচার করেছিল, কাজের বেলায় দেখলাম তার উল্টোটাই হয়েছে। হোরোকে বোর্ডিং থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি। সে বোর্ডিংয়েই আছে, অথচ তার সম্পর্কে যেন সব শাসন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

আমরা দেখে অবাক হয়ে যেতাম, এক একদিন বিকেলে ফাদার লিঙন টেনিস খেলছেন হোরোর সঙ্গে। আশ্চর্য! টুডু বোস্‌রা টিগ্‌গা—এরা হোরোর চেয়ে রুম কালো আর বেশী বিশ্বাসী খৃষ্টান। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওরা শুধু ফাদার লিঙনের টেনিস খেলার সময় বল কুড়িয়ে দেবার মর্যাদা পেয়েছে। তার বেশী নয়। আর ষ্টীফান একেবারে .....সত্যিই আশ্চর্য।

বোর্ডিংয়ের বাগানে বিকাল বেলা জল দেবার ভার ছিল হোরোর ওপর। কর্তব্যটুকুর বিনিময়ে হোরো বোর্ডিংয়ে ফ্রী খেতে পেত আর থাকত। আমরা দেখলাম, হোরো আর বাগানে যায় না, জল তোলে না। উদ্যানসেবার ভার টিগ্‌গার ওপর চাপানো হয়েছে। বেচারী টিগ্‌গা। সকাল বেলায় রান্নার জন্য কাঠ কাটে, তার ওপর আবার বিকেল বেলা জল তোলা।

টুডু এসেই আর একদিন একটা খবর দিল—আজকাল আর হাটে যাবার সুযোগ পায় না ষ্টীফান, প্রতি মঙ্গালবারে সারা দুপুর ফাদার লিঙনের ঘরে বসে পিলগ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস পড়ে। পড়া শেষ হলে নাকি চা-বিস্কুট খায় হোরো। ফাদার লিঙন খাওয়া।

আমাদের উৎসাহ ঔৎসুক্য আলোচনা আর গবেষণার সীমা ছিল না। অলক্ষ্যে কত বড়ো একটা ঘটনার দ্বন্দ্ব জমে উঠেছে, তার কিছু কিছু আভাস আমরা আমাদের অনুভব দিয়ে ধরতে পারছিলাম। একদিকে কেম্ব্রিজের এম-এ বিখ্যাত শিক্ষিত সুসভ্য ও শ্রদ্ধেয় ফাদার লিঙন। ..... অপরদিকে কোন্ এক জংলী মুণ্ডা ডিহির বুড়ো সোখা দীনতম নগন্য অর্ধোলঙ্গ বর্বরবেশী এক যাদুমন্ত্রা। যেন দুই যুগে লড়াই—বিংশ শতক বনাম প্রাক্ ইতিহাস। বুড়ো সোখা বোধ হয় সে লাঞ্ছনা ভুলতে পারে না—ছেলেধরা পাদরীরা তাদের ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, খৃষ্টান করে দিয়েছে হোরোকে। তারই প্রতিশোধ নেবে বুড়ো সোখা। এই সুসভ্য ডাইনদের দুর্গ থেকে আবার জঙ্গালের ছেলেকে জঙ্গালে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

ফাদার লিঙন তাই বোধ হয় সতর্ক হয়েছেন। ষ্টীফান হোরো যদি আবার জংলী হ'য়ে যায়, সে পরাজয় আর অপমান বড়ো বেশী করে বুকে বাজবে। সহ্য করা কঠিন হবে। লিঙন জানেন প্রতি মঙ্গালবারের হাটে বুড়ো সোখা আসে। একটা অরণ্য-আত্মা প্রতিশোধ নেবার জন্য যেন আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুযোগ খুঁজছে। চা-বিস্কুট টেনিস—সুসভ্যতার এক একটি প্রসাদ খাইয়ে হোরোকে যেন পোষ মানিয়ে রাখতে চাইছিলেন ফাদার লিঙন।

আমরা বলতাম—চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ। দেখা যাক্, কে জেতে আর কে হারে।

গুড ফ্রাইডের ছুটিতে সবাই দেশে যাবার ছুটি পেল। টুডু টিগ্‌গা বেস্‌রা খাল্‌খো সবাই চলে গেল। ওদের পক্ষে যাবার কোন বাধা ছিল না। কাঁধের লাঠিতে এক একটা পোঁটলা

ঝুলিয়ে জঙ্গালের পথে ত্রিশ চল্লিশ মাইল একটানা হেঁটে ওরা চলে যাবে নিজের নিজের ডিহিতে। কোন পাথেয় দরকার হল না। ততখানি পয়সা খরচ করার সামর্থ্যও নেই ওদের।

কিন্তু হোরোকে ছুটি দিতে রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়লেন ফাদার লিঙন। হোরো যেদিন গেল, সার্ভিস বাসটা এসে দাঁড়াল বোর্ডিংয়ের কাছে। আমরা দেখলাম, ফাদার লিঙন মাণিব্যাগ থেকে টাকা বের করছেন, বাসের টিকিট কেটে দিচ্ছেন হোরোকে।

আমাদের মধ্যে বাজি ধরা হল—হোরো আর ফিরে আসবে কি না। ইন্দু বলল—নিশ্চয়ই আসবে। ফাদার লিঙন ওর জংলীপনা ঘুচিয়ে দিয়েছেন। দুবেলা চা-বিস্কুট মারছে আজকাল। তার আস্বাদ কি ভুলতে পারবে হোরো।

আমি বললাম—আর ফিরে আসবে না হোরো। এখানে না হয় চা বিস্কুট আছে, কিন্তু ওদিকে যে .....।

ইন্দু—ওদিকে কি?

বললাম—চিরকি মুরমুকে ভুলে গেলে?

ইন্দু একটু নিরাশ হয়ে পড়ল।—তাই তো?

ছুটি ফুরিয়ে গেলে আবার বোর্ডিংয়ের জীবন চঞ্চল হয়ে উঠল। সবাই এসেছে। ষ্টীফান হোরো ফিরে এসেছে। ইন্দুর জিত হল। আমরা নিরাশ হয়ে পড়লাম। রাগ হ'ল হোরোর ওপর। হোরোটা সত্যিই একটা গবেট ও বেরসিক।

কিন্তু টুডুর কাছে গল্প শুনে আমাদের এই আক্ষেপ মুহূর্তে মুছে গেল। আমরা শুনলাম বুড়ো সোখার কথা, হোরোর কথা, চিরকি মুরমুর কথা। হোরোদের জঙ্গালের ছবিটা মুহূর্তের মধ্যে যেন দূরের ফোটা পলাশের আলেয়ার মতো আমাদের কল্পনার সীমাপ পারে দুলতে শুরু করে দিল। ইন্দু বলল—চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধে বুড়ো সোখার জয় অবধারিত।

হোরোর পাশের ডিহির ছেলে টুডু। খৃষ্টান টুডুরা অখৃষ্টানদের সঙ্গে মেশে না। টুডু তবু যেন গোয়েন্দার মতো হোরোর সব কীর্তি দেখে এসেছে। তবু টুডু প্রাণ থাকতে ফাদার লিঙনের কানে এসব কথা কখনও তুলবে না। হোরার ওপর প্রচণ্ড একটা শ্রদ্ধা ও মমতা আছে টুডুর। হোরোর কাছে গিয়ে কিছু বলতে পারে না ব'লেই আমাদের কাছে বলে। ব'লে ব'লে যেন স্তব্ধ শ্রদ্ধার বেদনা খানিকটা হালকা করে নেয়।

টুডু দেখেছে—একদিন তীর দিয়ে একটা হরিণ মেরেছিল হোরো। স্রোতের ধারে হোরো দাঁড়িয়ে ছিল ধনুক হাতে। চিরকি মুরমু তার পা ধুইয়ে দিচ্ছিল।

টুডু দেখেছে—চিরকি তাদের গাঁয়ের ঘুমঘর থেকে জ্যোৎস্নারাতে চুপে চুপে পালিয়ে এসেছে। হোরো আড়াল থেকে বেড়িয়ে এসে চিরকিকে হাত ধরে নিয়ে গেছে।

টুডু দেখেছে—হোরো খৃষ্টান হয়েও আখরাতে গিয়ে মাদল বাজিয়েছে। চিরকিও নাচে

কিনা সেখানে। বুড়ো সোখা ভালবাসে হোরোকে। কেউ তাই হোরোকে ঘৃণা করে না।

টুডু বলল—জংলীদের সঙ্গে মিশে দুদিন সেঙেরা করেছে হোরো। টাঙি হাতে উৎসবে পাগলের মতো নেচেছে। শিমূল গাছে আগুন ধরিয়েছে, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলেছে। সবার আগে এক লাফ দিয়ে এক কোপে জ্বলন্ত গাছ কেটেছে হোরো।

টুডু গলার স্বর খুব অস্পষ্ট করে ভয়ে ভয়ে বলল—আমি দেখেছি, তারপর গায়ের ফোস্কাতে ঠাণ্ডা বাতাস লাগবার জন্য আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হোরো। চির্‌কি মুরমু আস্তে আস্তে এসে হোরোকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে।

বোর্ডিংয়ের পাশে ছোটো মাঠের ঘাসের ওপর সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে আমরা টুডুর গল্প শুনছিলাম। হঠাৎ বোর্ডিংয়ের বারান্দ থেকে একটা বাঁশির স্বর ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে তারই সঙ্গে মিলিয়ে, তালে তালে মাথা দুলিয়ে, টুডু গুন্ গুন্ করে গাইতে লাগল।

রাতা মাতা বির্‌কো তালা
রে নালা হোম নির্ জা
রাগা ইংগা

উৎফুল্ল টুডুর হাবভাব আর উৎসাহ দেখে মনে হল, এখনি সে নাচতে শুরু করে দেবে।

—কে বাজাচ্ছে বাঁশী। কে?

আমাদের ব্যস্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে টুডু গান থামিয়ে বলল—ঐ, সেই গান। হোরো সেই সুরটা বাজাচ্ছে।

—কোন্ গান।

—চির্‌কি মুরমুর গান।

—গানটার মানে কি টুডু?

টুডু উত্তর দিল—গানটার অর্থ, শোন আমার জোয়ান বন্ধু, পালিয়ে যেও না, এই ঘন জঙ্গলে আমায় একা ফেলে চলে যেও না।

একটা পুলকের সঞ্চার আমাদের মনের অগোচরে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল। বললাম—এ যে আমাদের মতো গান টুডু।

ইন্দু চাপা সুরে আবৃত্তি করল। —শুন শুন হে পরণা পিয়া .....।

কিছুক্ষণ আবিষ্টের মতো নিঝুম হয়ে বসেছিলাম আমরা। বোধহয় আমরা মনে মনে চির্‌কি মুর্‌মু নামে বনের লতার মতো না-দেখা একটি মেয়েকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম—না, তোমার বন্ধু পালিয়ে যাবে না। আমরা প্রার্থনা করছি, হোরো তোমার কাছে ফিরে যাবে।

ফাদার লিণ্ডনের গর্জন শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম। বোর্ডিংয়ের বারান্দায় অন্ধকারে

যেন একটা ধস্তাধস্তি চলছে। টুডু দৌড়ে গিয়ে ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখে ফিরে এল। সন্ত্রস্তের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। ফাদার লিণ্ডন হোরোর বাঁশী ভেঙে দিয়েছে।

আমাদের সবার মনে একসঙ্গে ধক করে কতকগুলি প্রতিহিংসা শিখা জ্বলে উঠল। রাগের মাথায় বললাম—ঘা কতক জমিয়ে দিতে পারল না হোরো?

টুডু বিমর্ষভাবে বলল—আমারও কেমন ভয় হচ্ছে। হোরো বড়ো গোঁয়ার। ফাদারকে এর ফল টের পাইয়ে দেবে ষ্টীফান।

কিন্তু এরপর ষ্টীফান হোরোর গোঁয়ার্তুমির কোন প্রমাণ পেল না, বরং দেখলাম, গোঁ ধরেছেন ফাদার লিণ্ডন। ফাদার লিণ্ডনের অভিযান আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রতি সপ্তাহে একবার সফরে বের হন। কখন ভোজপুরী লেঠেল সঙ্গে যায়, কখন বা আট দশটা কনষ্টেবল। থানাতে একটা চিঠি দিলেই কনস্টেবল চলে আসে। যেন একটা যোদ্ধার দল নিয়ে দুদিনের জন্য জঙ্গল এলাকায় অদৃশ্য হয়ে যান ফাদার লিণ্ডন। সত্যিই তিনি একজন ধর্মযোদ্ধা। আমরা শুধু মনমরা হয়ে ভাবতাম ফাদার লিণ্ডনের এই রহস্যময় আনাগোনা কবে বন্ধ হবে? কবে শান্ত হবে তাঁর লালচে মুখের উত্তেজনা।

টুডুর কাছে শুনে স্পষ্ট করে বুঝলাম—মোরাঙ্গি পাহাড়ের মুর্‌মুদের ডিহিতেই ফাদার লিণ্ডনের অভিযান শুরু হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে এরই মধ্যে মাটির গির্জা তৈরি করে ফেলেছেন ফাদার লিণ্ডন। অরণ্যের বুকের ভেতর ঢুকে তিনি যেন লক্ষ্য বছরের বৃদ্ধ যত বোঙাদের শিলাময় বেদী কাঁপিয়ে দিয়ে এসেছেন।

খুব বেশী দিন পার হয়নি, শুনলাম, মোরাঙ্গি পাহাড়ে একটা হাঙ্গামা হয়ে গেছে। মাটির গির্জাটা ভেঙে ধুলো করে দিয়েছে। কে করেছে?

যে করেছে, তাকে আমরা স্বচক্ষে দেখলাম। বুড়ো সোখা। সেসন জজের আদালতে ভীড়ের মধ্যে মাথা গুঁজে আমরাও রায় শুনলাম—বুড়ো সোখার 'যাবজ্জীবন দীপান্তর'।

ষ্টীফান হোরোকে দেখতাম, বোর্ডিংয়ের বাগানে একটা বুড়ো বটের ঝুরিতে দোলনা বেঁধে সময় অসময় শুধু দোল খায়। দুলে দুলে যেন এক দুঃস্বপ্ন গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে নিচ্ছে ষ্টীফান হোরো।

নন-কো অপারেশন ঝড় বইল সারা দেশে। আমরা স্কুল ছাড়ব। জালিয়ানওয়ালা বাগের অপমান আমাদের অশান্ত করে তুলল।

আমরা বাঙালী আর বিহারী ছেলেরা স্কুল ছাড়লাম। রাজার ছেলেরা কেউ ছাড়ল না। খৃষ্টান ছেলেরাও নয়—টুডু টিণ্‌গা বেস্‌রা খাল্‌খো কেউ নয়। আমরা পিকেটিং করে ওদের বাধা দিতে লাগলাম।

আমাদের খুব ভরসা ছিল, হোরো আমাদের দলে আসবে। ফাদার লিণ্ডন যেভাবে ওকে

অপমান করেছে, জীবনে সে ওর কোন পাদরী বা সাদা-চামড়াকে সহ্য করতে পারবে কি না সন্দেহ।

আমরা স্কুলের ফটকে পিকেটিং করেছিলাম। দেখলাম হোরো আসছে।—স্বতন্ত্র ভারত কি জয়। জয়ধ্বনি করে আমরা হোরোকে অভ্যর্থনা জানালাম।

হোরো এগিয়ে এসে ইন্দুকে একটা ধাক্কা দিল, পরেশের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল। বন শূয়োরের মতো গোঁ গোঁ করে পথ করে ক্লাসে গিয়ে ঢুকলো।

সেইদিন হোরোকে আমরা ভাল করে চিন্‌লাম। পাদরীদের ক্রীতদাস, মনুষ্যত্বহীন মর্যাদাশূন্য, মূর্খ জংলী হোরো। স্বতন্ত্র ভারতবর্ষকে চিনল না, একটু শ্রদ্ধা করল না। চিনল শুধু ওর জঞ্জালটাকে। কিন্তু তোর জঞ্জালটা যে ভারতবর্ষের মধ্যেই রে বনবৃত্ত। ভারতবর্ষের বাইরে তো নয়।

আট বছর পরের কথা। আমি লেপো থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা। সকালবেলায় কজন বিরসাইট মুণ্ডা এসেছে হাজিরা দিতে। জেল থেকে আজই ওরা খালাস পেয়েছে। এখানে হাজিরা দিয়ে তারপর নিজের নিজের ডিহিতে চলে যাবে। বিরসাইট্‌রা অত্যন্ত সন্দেহভাজন জীব। প্রতি বছর হাঙ্গামা বাধায়। পুলিশকে ব্যতিব্যস্ত করে। জঞ্জাল আইন মানে না, মহাজনদের পিটিয়ে তাড়িয়ে দেয়, চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে চায় না। বাজারে বসলে তোলা দেবো না। জমি ক্রোক করতে গেলে আদালতের পেয়াদাকে টাঙি নিয়ে কাটতে আসে। দু'বছর আগে একবার স্বরাজ ঘোষণা করেছিল বিরসাইট মুণ্ডারা। পাদরীকে মেরেছে, পুলিশকে মেরেছে, অনেকগুলি পুল ভেঙেছে। ওরমান্‌ঝির জঞ্জালে একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল ওদের সঙ্গে।

সবচেয়ে শেষে হাজিরা লেখাতে যে লোকটা উঠে এল তার নাম রুন্‌নু হোরো।

ডায়েরীর ওপর থেকে চোখ তুলে লোকটার মুখের দিকে তাকালাম। তার মাথার চুলের জংলী খোঁপাটাও জটার চুড়োর মতো হয়ে গেছে। গলায় একটা ভেলাফলের মালা, আদুড় গা, কোমরে ছোটো একটি কাপড় জড়ান। হাতে একটা কাঁসার বালা। এই প্রাগৈতিহাসিক সজ্জার মধ্যে শুধু একজোড়া সুশানিত আধুনিক চোখ.....

বিস্ময় চাপতে গিয়ে তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বললাম—ষ্টীফান হোরো!

লোকটা মিষ্টি হেসে বলল—না না ঘোষ, আমি রুন্‌নু হোরো।

—তুমিও একজন বিরসাইট?

—আমি বির্‌সা ভগবানের শিষ্য!

—বির্‌সা ভগবান? সে কে?

—সে আমাদের গান্ধী ছিল ঘোষ। আমি তাঁকে চোখে দেখিনি, আমার বাবার মুখে তাঁর কথা শুনেছি। ইংরেজের জেলখানার অন্ধকারে একজন কয়েদির মতো মরে গেছে আমাদের বির্‌সা ভগবান। তাঁর চেহারা দেখতে কেমন ছিল জান ঘোষ!

কেমন?—যীশুখ্রীষ্টের মতো।

একটু চুপ করে থেকে হোরো বলল—আমাদের জঞ্জালে বাইরে থেকে অনেক পাপ এসে ঢুকেছে ঘোষ! তাই বির্‌সা ভগবান আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। তাঁর অনুরোধ কি ভুলতে পারি?

আমি ডাকলাম।—ষ্টীফান হোরো।

হোরো প্রতিবাদ করল।—বল, রুন্‌নু হোরো!

চুপ করে গেলাম। হোরো নিজে থেকেই খুশী হয়ে নানা খবর জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করল। ইন্দু কোথায়? পরেশ কি করছে?

চারদিকে একবার সাবধানে তাকিয়ে নিয়ে হোরোকে প্রশ্ন করলাম—এত রোগা হয়ে গেলে কেন হোরো?

হোরো—আমার টি-বি হয়েছে। আচ্ছা, এবার যাই আমি!

একটা কথা জানবার জন্য মনটা ছট্‌ফট্ করছিল। তবু সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। শেষে সাহস করে বলেই ফেললাম।—একটা খবর জানতে হড়ো ইচ্ছে করছে হোরো।

হোরো—বল।

—জিজ্ঞাসা করলাম—চির্‌কি মুরমু কোথায়?

হোরো শান্তভাবে উত্তর দিল।—ও; জানো না বুঝি? ফাদার লিণ্ডনের মিশনে চলে গেছে চির্‌কি। খৃষ্টান হয়েছে। এখন হাজারিবাগে কনভেন্টে থাকে।

ষ্টীফান চোখের দৃষ্টিটা চিক চিক করে উঠল, তীক্ষ্ণতীরের ফলার মতোই, কিন্তু জলে ভেজা। আর কোন কথা জিজ্ঞেস করা হল না, ষ্টীফানও নিঃশব্দে চলে গেল।

কাউকে মুখ ফুটে বলতে লজ্জা করবে, একটা ভুলের স্মৃতি কিছুক্ষণের জন্য কাঁটার মতো মনের মধ্যে বিঁধছিল, হয়ত আমরাই নিরপেক্ষ থেকে চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধে ষ্টীফানকে হারিয়েছিলাম। ষ্টীফানও বনবাসে চলে গেল।